Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XI, Issue-IV, July 2025, Page No. 64-71
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.13.issue.04W.009

পাকিস্তানি সিনেমা ও ওয়েব সিরিজে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

পুনম মুখার্জি, *গবেষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 30.06.2025; Accepted: 18.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

More than fifty years have passed since the Liberation War, yet Bangladesh has still not received full International recognition for the Genocide and mass rapes committed during that time. In recent years, several films and web series have been produced in Pakistan, set against the backdrop of the Liberation War. Instead of portraying the brutal realities of that period, these narratives are cloaked in falsehoods. Their underlying intent appears to be the misguidance of the younger generation. These productions perpetuate the fascist mindset that targeted the innocent people of Bangladesh in 1971, continuing that legacy through distorted storytelling.

Keyword: Liberation War, Genocide, Falsehood, Movie, Bangladesh, Pakistan, Web Series, 1971, Rape, Rights

আনন্দবাজার পত্রিকায় ২০২২ সালের ১৬ ই অক্টোবর ১৪-র পাতাতে একটা খবর বেরিয়েছিল। খবরের শিরোনামটা ছিল '৭১-র গণহত্যার স্বীকৃতি দাবি করে প্রস্তাব আমেরিকায়'। ওহায়োর সদস্য স্টিভ সাবো আমেরিকার প্রতিনিধি সভায় প্রস্তাবটি পেশ করে টুইটে লিখেছেন-

> "আজকের বাংলাদেশে পাকিস্তানের সেনারা যা ঘটিয়েছিল তা নাৎসিদের ইহুদি হত্যার মতো গণহত্যাই। বহু লক্ষ মানুষকে তারা হত্যা করেছিল। কৃৎকৌশলগত উন্নতির কারণে, বাংলাদেশে যে গণহত্যা পাকিস্তান চালিয়েছিল তার বিভিন্ন উদাহরণ নানা মাধ্যমে দেখা যায়।"[১]

গত কয়েক বছরে আন্তর্জালিক মাধ্যমে এবং ইউটিউব দেখলে এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে। পাকিস্তানের অনেক তরুণ-তরুণী সেগুলো জানেন। বর্তমানে পাকিস্তানি বেশ কিছু ইউটিউব চ্যানেলেও ৭১-এর যুদ্ধের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা চোখে পড়ে। কিন্তু পাকিস্তানি এস্টাবলিশমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় এই গণহত্যাকে অস্বীকার শুধু নয়, মুক্তিযুদ্ধের পুরো ইতিহাস বিকৃতায়ণের চেষ্টা চলছে।

জুনায়েদ আহমদের লেখা সেই বিকৃত ইতিহাস বইটির কথা মনে পড়ে যেটির পৃষ্ঠপোষক ছিল আইএসআই। সেই বইয়ের প্রতিবাদ জানানোর জন্য নির্মূল কমিটি এক সভা করেছিল।[২] শাহরিয়ার কবির মূল প্রবন্ধ পড়েছিলেন। সভায় উপস্থিত সংসদ সদস্য তোফায়েল আহমদের উদ্দেশে মুনতাসীর মামুন বলেছিলেন, সংসদে গিয়ে জাতীয় গণহত্যা দিবস পালনে আহ্বান জানাতে। জনাব আহমদ তখনই সংসদে চলে যান এবং এ বিষয়ে বক্তৃতা দেন। তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তখন ঘোষণা করেন ২৫ মার্চ হবে জাতীয় গণহত্যা দিবস, যার ফলে মানুষ নিয়ত স্মরণ করে পাকিস্তানিদের সেই গণহত্যা।

বাংলাদেশ যখন পাকিস্তানি গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি চাইছে তখন পাকিস্তান গোয়েবলসের মতো মিথ্যা প্রচারণায় নেমেছে। সেখানে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করে ওয়েব সিরিজ ও চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে। বাঙালি ও বাংলাদেশ সহ সমস্ত শুভবোধ সম্পন্ন মানুষের সোচ্চার হওয়া উচিত মুক্তিযুদ্ধের এই বিকৃতায়ণের বিরুদ্ধে। না হলে পাকিস্তান তো বটেই উপমহাদেশের সত্য ইতিহাসও পাল্টে যাবে।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে ফেসবুক স্ক্রল করার সময় বাংলাদেশের খবরের চ্যানেলে সম্প্রচারিত একটি ভিডিও চোখে পড়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে পাকিস্তানে একটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। ইতিহাস নির্ভর সিনেমার প্রতি একটা ঝোঁক, অনেকের মতো আমারও আছে। বিশেষত মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক সিনেমার বিষয়ে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলী নিয়ে বেশ কিছু সিনেমা নির্মিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত জহির রায়হানের *স্টপ জেনোসাইড*, নজরুল ইসলাম-এর *ওরা এগার জন,* বা *আমার বন্ধু রাশেদ, মেহেরজান, গেরিলা-র* মতো সিনেমার নাম মনে পড়ে। একাত্তরের যুদ্ধের অন্যতম একটি শক্তি অবশ্যই ভারত। স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন থেকে শুরু করে পাকিস্তানের পরাজয়, ভারতীয় সিনেমায় বারবার ফিরে এসেছে একাত্তরের যুদ্ধের স্মৃতি। *জয় বাংলাদেশ* (১৯৭১), *হিন্দুস্তান কি কসম* (১৯৭৩), *আক্রমণ* (১৯৭৫), *১৬ ই ডিসেম্বর* (২০০২), *১৯৭১* (২০০৪), *দ্য গাজি এট্যাক* (২০১৭), *রাজি* (২০১৮) *গদর ২*- যারও একটি অংশে আছে একাত্তরের বাংলাদেশ প্রসঙ্গ। গদর ২ তে স্পষ্ট ভাবে ত্রিশ লক্ষ শহীদ, ভারতে অবস্থান করা এক কোটি শরণার্থীর কথা স্বীকার করা হয়েছে।[৩]

মুক্তিযুদ্ধের প্রায় ৫০ বছরের বেশি সময়কাল অতিবাহিত। গত ৫০ বছরে মুক্তিযুদ্ধের নানা আঙ্গিক নিয়ে চর্চা কম হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত সাহিত্যকর্মগুলির ক্ষেত্রে বেশি অংশ জুড়ে আছে বাংলাদেশের জনমানুষের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ। পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন দেশের জন্ম হয়েছে। গণহত্যা, ধর্ষণ, বহু ত্যাগের বিনিময়ে পূর্ব পাকিস্তান হয়েছে বাংলাদেশ। পেয়েছে মুক্তি।

স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলাদেশের গণহত্যার যখন স্বীকৃতির দাবি করা হচ্ছে, তখন চলচ্চিত্র বা ড্রামাগুলিতে তথ্যের বিকৃতি, আসলে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে করা হচ্ছে কি? বিগত কয়েক বছরে মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক চলচ্চিত্র এবং ড্রামা নির্মাণের ঢেউ পাকিস্তানি বিনোদন জগতে এসেছে। দেশটির বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার সংকটজনক পরিস্থিতি; তার জন্য দায়ী কী? বিগত বছরগুলোতে দেশটির রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রশ্নের সম্মুখিন হয়েছে। দেশটির ডলারের রিজার্ভ যেমন কমেছে, তেমনি বিশ্ববাজারে পড়েছে দেশটির মুদ্রার দাম। করোনা পরবর্তীকালে পাকিস্তান অর্থাভাবের পাশাপাশি মুদ্রাস্ফীতি সহ খাদ্যসংকটের ও সম্মুখিন হচ্ছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ভাবে এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ হয়ে উঠছে। একাত্তর পরবর্তী পাকিস্তানি প্রজন্মকে বোঝানো সহজ ছিল যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্যুতির ফলে আদতে পশ্চিম পাকিস্তানের কোনও লোকশান হয়নি। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে সেই একই গল্পের গড্ডালিকা স্রোত চালানো সহজ নয়। আন্তর্জালিক মাধ্যমগুলির কারণে তথ্য পাওয়া সহজ লভ্য হয়েছে। ড্রামা আর ওয়েব সিরিজগুলি সহজেই ইউটিউবের মতো মাধ্যমগুলিতে দেখা যায়। ইউটিউবের দৌলতে বিগত তিন বছরে মুক্তিপ্রাপ্ত তিনটি ড্রামা নজরে আসে। *খোয়াব ট্যুট যাতে হ্যাঁয়নে, হাঙ্গর* S-131, *যো বিছার গ্যায়ে*-এর মতো ড্রামাগুলির ইউটিউবে কোটি কোটি ভিউ। প্রত্যেকটির বিষয় মুক্তিযুদ্ধ। অন্যদিকে *খেল খেল মে (২০২১), হুয়ে তুম আজনাবি (২০২৩)* সিনেমা দুটি বাংলাদেশে ব্যবসায়িক ভাবেও বেশ সফল হয়েছে। সিনেমাগুলির মূল বিষয়ও মুক্তিযুদ্ধ।

প্রথমে আসি *খেল খেল মে* সিনেমাটির প্রসঙ্গে। *খেল খেল মে* নামক পাকিস্তানি সিনেমাটি মুক্তি পায় ২০২১ সালে। ঘটনাটি এরকম, একটি বিখ্যাত পাকিস্তানি ইউনিভার্সিটি, যেখানকার প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী সফল। সাদ এখানে একমাত্র ব্যতিক্রমী। সে পরীক্ষাতে পাশ করতে না পারলেও তার বাবা ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট হওয়ায় তাকে পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়। সাদ আসলে ইউনিভার্সিটির ড্রামা ক্লাবটিকে সচল রাখতে চায়। ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ ড্রামা ক্লাবটিকে বন্ধ করে দিতে চায়। ঠিক এই সময় ঢাকা থেকে ইন্টারন্যাশানাল ড্রামাতে যোগদান করার একটি আমন্ত্রণ পত্র আসে ইউনিভার্সিটিতে। নতুন ভর্তি হওয়া ছাত্রী জারা এই প্রতিযোগিতাতে ১৯৭১ সালে ঘটা 'ঢাকা ফল' নিয়ে ড্রামা করতে বলে। মূল কাহিনির শুরু এখান থেকেই, জারা ছাড়া বাকিদের কাছে ১৯৭১ এর যুদ্ধ একটা পরাজয়ের নাম। সেই ইতিহাসকে নতুন প্রজন্ম মনে রাখতে চায় না। জারা ১৯৭১ সত্যি ঘটনাকে আশ্রয় করে নাটক করতে চায়। যে সত্যিকে তার মতো যুব সমাজ বিশ্বাস করে। জারা ১৯৭১ কে নিয়ে বেশি আবেগ আপ্লুত কারণ তার দাদু ৭১ এ ঢাকাতেই আটকে পরে যায়, তারপর থেকে তার আর কোনও খোঁজ পাওয়ায় যায়নি। জারার ঢাকা যেতে চাওয়ার অন্যতম কারণ সে দাদুকে খুঁজে বের করতে চায়। সাদ আর জারার নেতৃত্বে ইউনিভার্সিটির কিছু ছাত্র ঢাকাতে আসে নাটকের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে, যে নাটকটি নৃত্যনাট্যের আদলে লিখেছে জারা। বাংলাদেশ এয়ারপোর্টের বাঙালি অফিসাররা পাকিস্তানি ছেলেমেয়েদের নিয়ে হাসাহাসি করে। একটি বাংলাদেশি

মেয়েকে হিন্দি বলতে পারার কারণে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাকিস্তানি দলটির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়।[৪] ৭১-এর সময় থেকেই পাকিস্তানি জনমানসের মধ্যে পরাজয়ের কারণ হিসাবে যে বাঙালি বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনি গ্রথিত করা হয়েছে এ সিনেমার গল্পও সেই একই ছেলে ভোলানো গান শোনায়। ভারত থেকে আসা ছাত্ররা পাকিস্তানি ছাত্রদের বিরক্ত করে, বাংলাদেশি ছাত্রদের প্রতি তাদের আচরণ বন্ধুত্ব সুলভ হলেও প্রচ্ছন্ন আধিপত্য বিস্তারের আবেশ কাজ করে। জারা পুরো সিনেমা জুড়ে মনে করাতে থাকে, তার মতে 'বর্তমান জেনারেশন হয়তো ৭১ এর ঘটনাকে নিজেদের ভুল মনে করে, সেই ভুলকে ভাঙাতেই নাটক। ইতিহাসকে গল্পের মতো বললে কেউ ভোলে না।' জারা তার দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঢাকার রাস্তাতে ঘুরতে থাকে, শেষ পর্যন্ত উর্দুভাষীদের এক বস্তিতে দাদুর দেখা পায়। দাদু গল্প বলে কীভাবে ভারতীয় সৈন্যরা উর্দুভাষী, বাঙালিদের খুন করেছে। সেই খুন, গণহত্যার দোষ তারা চাপিয়েছে পাকিস্তানিদের উপর। শেষ পর্যন্ত নৃত্যনাট্যটি অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্যের সবচেয়ে বড় অস্ত্র কল্পনার এক আদর্শ উপস্থাপন ঘটে। এক চরম বিকৃত ইতিহাসের জন্ম হয়। যেখানে বাঙালিরা পাকিস্তানিদের কে ভুল বুঝেছে, তারা মুখোশধারী ভারতীয়দের শিকার। আসলে ৭১ এর মুক্তিযদ্ধের পটভূমিতে রচিত প্রতিটি ড্রামা, চলচ্চিত্র কোথাও না কোথাও একই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সাজানো। পূর্ব থেকে পশ্চিমের বিচ্ছেদকে তারা বর্তমান প্রজন্মের কাছে প্রকাশ করতে চায় এক দুখের মোড়কে, নিজেদেরকে পরিস্থিতির স্বীকার হিসাবে দেখানোর মধ্যে দিয়ে আসলে তরুণ প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় না। সিনেমাতে দেখানো হয়, পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধারা আসলে 'হিন্দুস্থানী'। *খেল খেল মে*-এর বিশেষত্ব এই যে ৭১ এর যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয়ের ইতিহাস অস্বীকার করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই এক নতুন গল্পের অবতারণা তারা করে। ঢাকার পতনের বিস্তারিত ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব থাকায় সেই গল্পের বিক্রিও সহজ হয়েছে।

যে নাটকের ঘটনা দিয়ে সিনেমার শুরু, সেই নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা যায়, মুক্তিবাহিনীরা আসলে নিজেরাই নিজেদের মেরেছে। পাকিস্তানিদের কাছে পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। পশ্চিম পাকিস্তানিরা তাদের ভাইদের মারতে চায়নি, তাই তারা পূর্ব পাকিস্তানের কর্তৃত্ব ছেড়ে দিয়েছে। প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু এক মুহূর্তে অসত্য হয়ে যায়। গৌরবের বিজয় করুণায় পর্যবসিত হয়। এখানেই শেষ নয়, যেহেতু বাংলাদেশি এবং পাকিস্তানিদের 'খুদা' এক, তাই পারস্পরিক ভুল বোঝাবোঝি মিটিয়ে উভয়ের উভয়কে ক্ষমা করে দেওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে ২০২১ সালে মুক্তি পাওয়া ডকুমেন্ট্রি সিনেমা *সেপারেশন অফ ইস্ট পাকিস্তান- দ্য আনটোল্ড স্টোরি* নিয়ে সেনেটর জাভেদ জব্বরের করা মন্তব্য মনে পড়ে। তাঁর মতে—

> "The separation of East Pakistan is not the last attempt to know the obscure facts about the fall of Dhaka in 1971 as how the history has purposefully been manipulated against Pakistan to ensure continued unrest between the two Muslim nations who were once part of the same country."[৫]

কী অদ্ভুত ভাবে সিনেমার চরিত্র আর পাকিস্তানের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত এক ব্যাক্তির বক্তব্য এক হয়ে যায়। ভুল স্বীকারের থেকে ইতিহাসের বিকৃতায়ণের দিকে তাদের উৎসাহ বেশি।

দ্বিতীয় সিনেমাটির নাম *হুয়ে তুম আজনাবি*। লাহোর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছে জিনাত এবং নিজামউদ্দীন। জিনাত বাঙালি। নিজামউদ্দীন উর্দুভাষী। তারা পূর্ব পরিচিত নয়। পরিচিত হয় ঢাকা ইউনিভার্সিটি তে এসে। নিজামউদ্দীন কিছুদিন পরেই জিনাতের প্রেমে পড়ে। প্রেম যখন সবে শুরু, নিজামউদ্দীন ও জিনাত দুজনেই লাহোর ফিরে যায়। লাহোরে আসার পর নিজামউদ্দীন জানতে পারে জিনাত আসলে একজন 'তওায়েফ'।

প্রেমের গল্প। মান-অভিমান বিচ্ছেদের আগুনের সেঁকা হয়ে তবে তো প্রেম জমবে! সিনেমা জমানোর আরও নানা উপকরণ পরিচালক মজুত রেখেছেন। পূর্ব পাকিস্তানে ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে স্বাধীনতার লড়াই। নায়িকা জিনাত মুজিবপন্থী। লাহোরের বাইজি বাড়িটি আসলে মুক্তিবাহিনীর একটি প্রধান আখড়া। মুক্তিবাহিনী প্রধান ফারুক। বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হওয়ার আগে তার হাতেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার লড়াইয়ের দায়িত্বভার দিয়ে গেছেন।

কোট প্যান্ট পরিহিত এই মুক্তিবাহিনীর লিডারের, পূর্ব পরিচয় সিনেমার কোথাও দেখানো হয়নি। যদিও তারই নির্দেশে বাইজি বাড়ির প্রধান খালম ভারত থেকে পাঠানো অস্ত্র লুকিয়ে রাখে। অবশ্য নিজামউদ্দীন বা জিনাতের এসব নিয়ে খুব একটা মাথাব্যথা নেই। মুক্তিবাহিনীর বাঙালি অফিসার জব্বার জিনাতের সঙ্গে রাত কাটাতে চাইলে

নিজামউদ্দীন তাকে বাঁচায়। দু'জনে বিয়ে করে। ততক্ষণে অবশ্য বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন। পাক আর্মি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে এসে 'শান্তি বিঘ্নকারী' মুক্তিফৌজকে মেরে, নিরস্ত্র বাঙালিদের বাঁচানোর স্লোগান দিচ্ছে। কিন্তু এতকিছুর পরও 'ঢাকার পতন' হয়। এরপর শুরু আসল গল্প, জিনাত অভিমানে বাংলাদেশে চলে আসে। খালমও তার সাথে বাংলাদেশে এসে 'কোঠা'য় নাচের মেহফিল বসায়। নিজামউদ্দীন জিনাতকে ভুলতে পারে না।

জব্বার, ফারুকের নেতৃত্বে কালো প্যান্ট শার্ট পরা, কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা মুক্তিবাহিনী যখন বাংলাদেশে বসবাসকারী উর্দুবাসীদের উপর 'গণহত্যা' চালাচ্ছে, মেয়েদের ধর্ষণ করছে, তখন নিজামউদ্দীন বাংলাদেশে আসে জিনাতকে খুঁজতে। শেষ পর্যন্ত সে জিনাতকে খুঁজে পায়। দেশভক্ত পাকিস্তানি সেনা অফিসারদের সাহায্যে পাকিস্তান ফিরে যায়।[৬]

দেশভাগের পর থেকেই উপমহাদেশে ভারত-পাক সম্পর্ক নিয়ে চাপানউতর আছে। ৭১-এর পরাজয়ের কারণ হিসাবে ভারতকে কাঠগড়ায় তোলা হয়ছে। কিন্ত এই সিনেমাগুলির চিত্রনাট্য থেকে বোঝা যায়, বাঙালিদের প্রতি এক সুদূরপ্রসারি ঘৃণা বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে তারা সঞ্চারিত করতে চায়। তাই ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত দেখানো হয়। শিক্ষক, বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ভারতীয় গুপ্তচর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে এক ধরণের আড়ালে রাখা হয়। বঙ্গবন্ধুকে ভারতীয় রাজনৈতিক, বিচ্ছেদকামী হিসাবে দেখিয়েও, এই আড়াল রাখার কারণ হয়তো বর্তমানে পাকিস্তানের তরুণ প্রজন্মের মধ্যেই বাঙালি এবং বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কিছু ইতিবাচক ধারণা তৈরি হচ্ছে। বর্তমানে উপমহাদেশে বাংলাদেশের গ্রহণ যোগ্যতা বারার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ভাবেও বর্তমানে পাকিস্তানের থেকে বাংলাদেশ এগিয়ে। ফলে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসলে বাংলাদেশের ক্ষতি হয়েছে, এই ন্যারেটিভ তরুণ পাকিস্তানি প্রজন্মকে বিশ্বাস করানো মুশকিল। আর তাই ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়ে একটা গোটা প্রজন্মকে ভুল ইতিহাসে বাঁচতে শেখার প্রক্রিয়া চলছে। সিনেমাটির দৃশ্যের পর দৃশ্য জুড়ে দেখানো হয় ইন্দিরা গান্ধির অখণ্ড হিন্দু রাষ্ট্র গঠন করার বাসনাকে পূরণ করছেন বঙ্গবন্ধু। হিন্দুদের প্ররোচনাতেই মুক্তিফৌজ গঠন হয়েছে।

শুধু বাঙালির অসাম্প্রদায়িক মনোভাব বা বাঙালি জাতিসত্তাকে রক্ষা করা মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। সংগ্রামী এক বাঙালি নেতা পুরো সিনেমা জুড়ে যেন বড় অসহায়। পঞ্চাশের দাঙ্গার পর বঙ্গবন্ধু ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে বারবার তিনি যে কথা বলেছিলেন, তা হলো হিন্দুরা দেশ যাতে ত্যাগ না করে। বাঙালি ঐতিহ্যকে রক্ষায়, অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়তে, সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার বিষয়টি তাঁর কাছে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল।

এসব কথা মনে চলে আসে কারণ পাকিস্তানি এই পুরো সিনেমাটটি জুড়ে সাম্প্রদায়িক আফিমের চাষ করেছেন পরিচালক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তাঁর কাছে কেবলমাত্র ভারতীয় আগ্রাসনের একটা রূপ। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা তাই ভারতের পতাকা হাতে নিয়ে স্লোগান দেয় তার সিনেমায়। ঢাকা ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস হয়ে ওঠে অন্যতম জঙ্গি কার্যালয়। বাঙালি অফিসারেরা পাকিস্তানি মেয়েদের ইজ্জত লুট করে এমনকি ঢাকা ইউনিভার্সিটির বাঙালি ছাত্ররাও বাঙালি মেয়েদের সম্ভ্রমহানি করতে চায়। বঙ্গবন্ধুর একমাত্র কামনা, কীভাবে তিনি ইন্দিরা গান্ধীকে খুশি করবেন। ইন্দিরা গান্ধি হাতজোড় করে পূজা করেন। রাম রাজ্য বানাতে চান বাংলাদেশকে।

ভারতীয় সৈন্যরা, সেনাবাহিনীর পোশাক না পড়ে গেরুয়া উত্তরীয় গলায় ঝুলিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করে। ভারতীয় কালচারাল মিনিস্টারের সামনে উর্দুভাষী মুসলমান মেয়েদের ভজন গাইতে বাধ্য করে মুক্তিবাহিনী। এমন আরও কত মণিমুক্তা ছড়িয়ে পরিচালক পাকিস্তানি জনগণকে সিনেমাটি উপহার দিয়েছেন। প্রত্যেকটা দেশের শাসন ব্যবস্থা একটি নিজস্ব ইতিহাস থাকে, তবে সেই ইতিহাস রচনার পিছনে জাতির ঐক্য রক্ষার প্রতি একটা দায়বদ্ধতা থাকে প্রশাসনের। মিথ্যার জোলাপ খাইয়ে জনগণকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা বৃথা। সেই বৃথা চেষ্টায় ১৯৭১ এর ১৬ ই ডিসেম্বর এর হত্যাকাণ্ডকে জাস্টিফাই করতে পরিচালক সংবাদপত্রের শিরোনামের ছবি দেখান পর্দায় Genocide Ethnic Cleansing of West Pakistanis in Dhaka Innocent Children Parents Executed by Mukti Bahini. সিনেমাটি শেষ করে ইউটিউবের দৌলতে পরিচালক কামরান এর কয়েকটি ইন্টারভিউ দেখতে পাই।

কামরান শাহীদের বানানো এটি প্রথম সিনেমা। তাঁর আব্বা সত্তর-আশির দশকের বিখ্যাত পাকিস্তানি চলচ্চিত্র অভিনেতা শাহীদ। কামরান শাহিদ পাকিস্তানি জনপ্রিয় চ্যানেল দুনিয়া নিউজে On The Front With Kamran Shahid নামে বিখ্যাত একটি অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করতেন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলছিলেন লন্ডনের এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে তিনি এম.ফিল করেছেন। প্রচুর অর্থনৈতিক সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রায় সবকটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করেছেন, ইতিহাসকে ভালোবাসেন বলে। ৩৫-৪০ কোটি টাকায় নির্মিত এই বিগ বাজেটের সিনেমাটিতে পাকিস্তানি জনগণের সামনে একাত্তরের সত্য তুলে ধরা তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। উপমহাদেশের জনগণের বিশ্বাস বড় সহজে অর্জন করা যায়। বিখ্যাত গবেষক আনম জাকারিয়া, তাঁর *1971–A People's History from Bangladesh, Pakistan and India* এর বইটির একটা অংশের কথা মনে পড়ছিল। জাকারিয়া মুনতাসীর মামুনকে তাঁর খুলনা সফরের সময় জানতে চেয়েছিলেন কেন মামুন *১৯৭১ গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর* তৈরির উদ্যোগ ঢাকাতে না নিয়ে খুলনাতে নিয়েছেন? এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঢাকার বাইরের তরুণ প্রজন্ম যাতে ১৯৭১ এর কথা না ভোলে, তারা যেন মনে রাখে এবং প্রতিরোধ করে। যাতে তারা পাকিস্তানি আমলে ফিরে না যায়। এই উক্তির সত্যতা এখানেই যে, ভুলিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা ক্রমাগত চলছে।[৭] বাঙালি সত্তাকে অসম্মান করার জন্যই হয়তো তাই *হুয়ে তুম আজনাবি*'র পরিচালক যেখানেই মুক্তিবাহিনীর গণহত্যা চালানোর দৃশ্যপট সাজিয়েছেন, পর্দায় ভেসে উঠেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি। বাঙালি কবির দুঃখ এখানেই শেষ হয়নি। মুক্তিফৌজ প্রধান যখন ভারতীয় মন্ত্রীকে খুশি করতে উর্দুভাষী বালিকাকে উপহার দেয় তখনও ক্যানভাসে থেকেছেন শুধু রবীন্দ্রনাথ।

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত ইতিহাস নির্ভর ড্রামাগুলির ক্ষেত্রেও চরম পর্যায়ে ইতিহাস বিকৃতি ঘটেছে। একাত্তরকে কেন্দ্রে রেখে নির্মিত ড্রামাগুলির ক্ষেত্রে চারটি বিষয় অপরিবর্তিত ভাবে এসেছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে চিহ্নিত করার প্রয়াস করে, ড্রামাগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ—

১. পশ্চিম পাকিস্তান আসলে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের শিকার। পূর্ব-পাকিস্তান এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন মতাদর্শ গত পার্থক্য ছিল না। যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইসলাম ধর্ম অবলম্বনকারী তাই ভারতীয় অশুভ অঙ্গুলিহেলন ছাড়া পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ, পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে বিচ্ছেদ চাইতো না।

২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কীভাবে জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা ভারতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট করেছে। উর্দূভাষী শিক্ষার্থীদের প্রতি বাঙালি শিক্ষকদের আচরণ নক্কারজনক। বিশ্ববিদ্যালয় জঙ্গি কার্যকলাপের আঁতুর ঘর। বাঙালি ছাত্ররা রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করে, নিজেদের কার্যসিদ্ধি করতে চায়। মূলত ছাত্ররা ভারতীয় সংস্কৃতি আসক্ত এবং এই কারণেই পাকিস্তানের একতা ভাঙতে চায়।

৩. বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের চরিত্রটিকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত না করা। পাকিস্তানের বিনোদন মাধ্যমে নির্মিত প্রায় প্রতিটি ড্রামা,চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেই বঙ্গবন্ধু চরিত্রের দৃঢ়তাকে খর্ব করার একটা প্রবনতা নজরে আসে। ড্রামাগুলির ক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধুর চরিত্রটিকে ধোঁয়াশার আড়ালে রাখা হয়। পারিপার্শ্বিক ব্যাক্তিদের মতামত দ্বারা তিনি প্রভাবিত এবং একক সিদ্ধান্ত গ্রহনে অসমর্থ। বঙ্গবন্ধুকে একসময় পাকিস্তানের সরকার দেশদ্রোহী'র তকমা দিয়েছিল। বর্তমানে গণমাধ্যমের এই রাজত্বের যুগে তথ্যের বিকৃতি ঘটানো সহজ নয়। পাকিস্তানের বহু সংবাদপত্র, বঙ্গবন্ধু আসলেই দেশদ্রোহী ছিলেন কী না এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। ফলে বঙ্গবন্ধু'র চরিত্রে এই আড়াল রাখা, আসলে সত্যকে প্রকাশ না করার প্রয়াস।

৪. গণহত্যার ক্ষেত্রে দেখানো হয় পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ, তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে অবস্থানরত পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষদের হত্যা করেছে। অর্থাৎ পূর্ব-পাকিস্তানে সামান্য পরিমানে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। তবে সেই গণহত্যা ঘটিয়েছে অনুপ্রবেশকারী ভারতীয় সৈন্যরা। এবং জঙ্গি কার্যকলাপে লিপ্ত তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালিরা।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে ড্রামাগুলির কাহিনি নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

হাঙ্গর S-131 ড্রামাটির কাহিনি নির্মিত হয়েছে ৭১ সালে ভারতের সঙ্গে হওয়া, পাকিস্তানের সাবমেরিনকেন্দ্রিক যুদ্ধকে নিয়ে। তবে চরিত্রদের পারস্পরিক কথোপকথন থেকে স্পষ্ট, পূর্ব-পাকিস্তান আসলে একাত্তরের পাকিস্তান ভাঙার জন্য দায়ী। পশ্চিম পাকিস্তানি সেনারা কেবল তাদের মাতৃভূমি রক্ষা করার জন্য লড়াই করছে। অভিনেতাদের কথোপকথন থেকে বোঝা যায় ভারতীয় চক্রান্তে তাদের নিজেদের দেশের মানুষের সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে। পূর্ব-পাকিস্তান আর পশ্চিম-পাকিস্তানিরা আসলে ভাই। পূর্বের থেকে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা তারা এখনও বয়ে বেড়াচ্ছে।[৮]

এরপর *খোয়াব ট্রুট যাতে হ্যায়ন* ড্রামাটির প্রসঙ্গে আসা যায়। ড্রামাটির এপিসোড সংখ্যা ৪টি। কেন্দ্রীয় চরিত্র একাত্তর সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। দুটি কন্যা সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর সুখের সংসার। চরিত্রটির নাম সৈয়দ সাজ্জাদ হুসেন। সাজ্জাদ হুসেন নিজেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। একাত্তরের অশান্ত সময়ে পাকিস্তানি আধিকারীকদের তাকে উপাচার্য হিসাবে নিয়োগপত্র দেওয়ার মনোবাঞ্ছা শুনেও, তিনি ইতস্তত করেন। কারণ তাঁর কথায় 'এখন শুনেছি ওখানে পড়াশোনা হয় না'। সৈয়দ সাজ্জাদ দায়িত্ব নেওয়ার পর, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কিছু প্রচলিত পাকিস্তানি ভাবনার ঘটনাপট দেখানো হয়। বাঙালি অধ্যাপক চরিত্র ডঃ মুনির বলেন 'আমরা ন্যাচারালি কলকাতার দিকে ঝুঁকে থাকব, লাহরের দিকে নয়'। অর্থাৎ অধ্যাপকেরা ভারতীয় নীতি দ্বারা প্রভাবিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালি ছাত্ররা অবাঙালি ছাত্রদের জখম করে। সাজ্জাদের স্ত্রী তার বন্ধুকে বলেন 'ছাত্রদের বই কেন ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বারা মদত পুষ্ট হবে?' ড্রামাটির এই অংশে এসে স্বাভাবিক ভাবেই একাত্তর সম্পর্কে সন্দেহ তৈরি হয়। এত সুচারু ভাবে বাঙালিদের সামগ্রিক ভাবে কালিমালিপ্ত করা হয়েছে যে একাত্তরের প্রকৃত ইতিহাস না জানা যেকোন ব্যাক্তি বিভ্রান্ত হবে। সমগ্র ড্রামা জুড়ে থাকে বিহারীদের উপর চলা গণহত্যার ছবি। চোখ বেঁধে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করিয়ে তাদের উপর গুলি চালানো হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে বাঙালি ছাত্রদের উপর হওয়া গণহত্যার এক চরম ঐতিহাসিক বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। আর্মি, উপাচার্য সাজ্জাদের কাছে অনুমতি চায় ছাত্রাবাসে আক্রমন চালানোর জন্য। তারা কারণ দেখায় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা উর্দুভাষী মেয়েদের ছাত্রাবাসের সামনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালি ছাত্ররা জঙ্গি কার্যকলাপ চালাচ্ছে। সাজ্জাদকে বলা হয় ছাত্রীদের বাঁচাতে বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমনের প্রয়োজন। সাজ্জাদ এই কথা মেনে নেয়। আর্মিরা ছাত্রদের অস্ত্র ফেলে দিতে বলে কিন্তু ছাত্ররা প্রথম অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ায় বাধ্য হয়ে প্রাণ বাঁচাতে আর্মিকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছাত্রদের অশান্ত করে তুলে কলকাতা পালিয়ে যায়। আর্মির মতে তারাই প্রকৃত দোষী। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়পর্বে যে সমস্ত অভিযোগ পাকিস্তানি সেনার উপর উঠেছে, একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় সেই সবগুলি অভিযোগের এক বিপরীত ন্যারেটিভ তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে। সাজ্জাদ সব কিছু থেকেই এক নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে। কিছু ক্ষেত্রে তার সংলাপে পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্রদের বা সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হলেও পরমুহূর্তেই এক পশ্চিম-পাকিস্তানির সংলাপে সাজ্জাদ ভুল প্রমানিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নির্মিত প্রায় প্রতিটি ড্রামা বা সিনেমার ক্ষেত্রেই পরিচালকেরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন।[৯] পাকিস্তানি ভাবাদর্শ প্রচার করার জন্যই সাজানো প্রশ্ন উত্তর মালা নির্মাণ করা হয়। যার পরিনতিতে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিম-পাকিস্তানই যে আসল ভিকটিম তাই প্রমানিত হবে। পুরো ড্রামাটির সিনেমাটোগ্রাফির অনেকাংশ জুড়ে থাকে ধোঁয়াটে রঙ। আলো-আঁধারি রঙের খেলায়, সচেতন দর্শক সহজেই বুঝতে পারবেন প্রতিটি দৃশ্যের ভিতরে লুকিয়ে আছে অন্য এক দৃশ্য। একাত্তর নিয়ে সৃষ্ট ড্রামা এবং চলচ্চিত্রগুলির ক্ষেত্রে সচেতন ভাবে বিরুদ্ধ ন্যারেটিভ তৈরি করার চেষ্টা করা বর্তমান প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে। এই আলো-আধাঁরি যেন তারই প্রতীক।

খোয়াব ট্রুট যাতে হ্যায়ন দেখতে দেখতে স্বাভাবিক জিজ্ঞাসু মন কিছু প্রশ্ন তুলতে পারে। সামান্য ইতিহাস সচেতন মানুষ চিত্রনাট্যের অতিনাটকীয়তা বা মিথ্যাচারকে ধরতে পারবেন। তবে পরবর্তী ড্রামাটির ক্ষেত্রে সত্যি-মিথ্যার এমন জাল বোনা হয়, যা কেটে বার হওয়া মুশকিলের।

Col. Z. I Farrukh এর *Bichar Gaye* এর কাহিনি অবলম্বনে *Haissam Hussain* এর নির্দেশনায় ১৪ টি পর্বের একটি ড্রামা *যো বিছার গ্যায়ে*।[১০] ড্রামাটির প্রধান তিনটি চরিত্র সোনিয়া আনওয়ার, ক্যাপ্টেন জেড. আই. ফারুক এবং শরীফ ইমাম রুমি। রুমি আর সোনিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সম্পর্কে তারা খুড়তোত ভাই বোন। ড্রামাতে প্রথমেই দেখা যায়, রুমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের দ্বারা প্রভাবিত। রুমির ব্যক্তিত্ব, তার বাচনভঙ্গী তাকে উপযুক্ত করেছে নেতা হয়ে ওঠার জন্য। সোনিয়া অবশ্য দেশ জুড়ে চলতে থাকা কর্মকান্ডকে

বিচ্ছিন্নবাদীদের কার্যকলাপ বলে মনে করে। রুমির সঙ্গে এই নিয়ে তার তর্ক-বিতর্ক চলে। পূর্ব-পাকিস্তানের এই অশান্ত সময়ে ফারুক পাকিস্তানি আর্মিতে যোগদান করে। উর্দ্ধতন অফিসারের নির্দেশে গোয়েন্দা হিসাবে কাজ শুরু করে। নজরদারি চালানোর কাজে তার আনাগোনা শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সোনিয়ার সঙ্গে আলাপ হয়। বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। একাত্তর নিয়ে পাকিস্তানে প্রচলিত ন্যারেটিভকে প্রচার করতে এখানেও সোনিয়া প্রশ্ন করে, উত্তর জেনে। রুমি সহ বাকি বাঙালি ছাত্রদের কার্যকলাপ, তাদের দেওয়া জয় বাংলা শ্লোগান সব কিছুকেই সে ভারতীয়দের চক্রান্তের একটা অংশ হিসাবে দেখে। একাত্তর সালের মাঝামাঝি এসে পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। এখানেও গল্প সেই একই সরলরেখায় চলে। পাকিস্তানি সেনারা এই কাহিনিতেও অসহায়। বাঙালিদের প্ররোচনাতেই অসহায় পশ্চিম-পাকিস্তানি আর্মি হাতে বন্দুক তুলে নেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তানি সৈন্য গুলি চালায় বাঙালি জঙ্গিদের নিকেষ করতে। সোনিয়ার ভাই, যে মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার বানাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিল; দুপক্ষের গোলাগুলির মধ্যে আটকে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। রুমি ভারতে চলে যায়। সেখান থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং দেশ স্বাধীন হলে ফিরে আসে।[১১]

যো বিছার গ্যায়ে নিয়ে লেখার শুরুতেই বলেছিলাম সমস্যা হচ্ছে সত্যি মিথ্যার বুনন। অনেক মৃত্যু দৃশ্যের মধ্যে একটি কিশোরের মৃত্যু দৃশ্য পাকিস্তানি জনতার মন আবেগতাড়িত করবে ঠিকই, তবে তাদের মনে হবে এ মৃত্যুর জন্য দায়ি আদতে বাঙালিরা। বাঙালি বুদ্ধিজীবি শ্রেণী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা, তাদের ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক মনোভাব জিন্না'র সাধের পাকিস্তান ভেঙেছে।

পাকিস্তানি মানসিকতার সর্বগ্রাসী পরিনাম যে বাঙালিকে বয়ে বেড়াতে হবে, তার নিদর্শন রুমি চরিত্রটি। পাকিস্তানি অভিনেতা ওয়াহাজ আলি চরিত্রটিতে অভিনয় করেছেন। তাঁর পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত সুঠাম চেহারা। বাংলা মিশ্রিত উর্দূ উচ্চারণ এবং সর্বোপরি চোখ মুখে ফুটে ওঠা এক দিকাভ্রান্ত বাঙালি তরুণের চাহনি পাকিস্তানি জনগণকে শান্তি দেবে। কীভাবে তা সম্ভব হবে? সম্ভব হবে কারণ মুক্তিযোদ্ধা রুমি দেশে ফিরে এসে ক্ষমতা দখল করতে চায়। নিজের পুরানো সঙ্গীদের হত্যা করে। বোঝা যায় ক্ষমতা দখলের লড়াই এ সে বঙ্গবন্ধুকেও পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারে। সেই আভাস দিয়ে ড্রামাটি শেষ হয়। পশ্চিম-পাকিস্তানিরা হেরে গেছে। কিন্ত এমন এক পরবর্তী প্রজন্ম তারা বাংলাদেশে রেখে গেছে যারা ক্ষমতার লোভে দুষ্ট। এটাই তো প্রাপ্তি। পাকিস্তানি জনগণের সান্ত্বনা।

পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালিদের সেই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কী চোখে দেখে তা আমরা জানি। করাচি, লাহোরের মতো শহরে বস্তিবাসী বাংলাভাষি মানুষের সাক্ষাৎকারের অনেক ভিডিও বর্তমানে ইউটিউবের দৌলতে দেখা যায়। তবে বৃহত্তর জনমানুষের জীবনে বাঙালি সংস্কৃতি, বাঙালি নারী সর্বোপরি বাংলাদেশের সম্পর্কে ধারণা ঠিক কীরকম, বিনোদনের দুনিয়া থেকেই দু'একটি উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে। ফ্যাসিস্ট মানসিকতা পাকিস্তানের একটি বড়ো অংশ এখনও বহন করে চলে। তাদের সিনেমা, ড্রামা তারই বহি প্রকাশ ঘটে যায় মাঝে মাঝে। বিগত বছরে *তেরে বিন* নামক একটি পাকিস্তানি ড্রামা নিয়ে উপমহাদেশে প্রচুর চর্চা হয়েছে। ড্রামাটির জনপ্রিয়তা এবং বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ড্রামাটির প্রতি আগ্রহ নিয়ে বিখ্যাত দৈনিক 'প্রথম আলো' সংবাদও প্রকাশ করেছে তাদের পত্রিকায়। রোমান্টিক এই ড্রামাটির খল চরিত্রটি নায়ক নায়িকাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য জাদুবিদ্যার সাহায্য নেন। ভয়ংকর সে জাদুবিদ্যা। তাতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। দেখে আশ্চর্য হতে হয়, প্রায় একচেটিয়া উর্দুভাষী সংখ্যাগুরুদের দেশে এই তান্ত্রিক চরিত্রের মহিলাটিকে বাঙালি হিসাবে দেখানো হয়েছে; যে অর্থের জন্য, স্বার্থের জন্য প্রেমের সম্পর্ক ভেঙে দিতেও পিছপা হয় না।[১২] এরপর যে ড্রামাটির উদাহরণ দিয়ে শেষ করব তার নাম *মেরে পাস তুম হো*। ড্রামাটির একটি এপিসোডের উপর পাকিস্তানি বিনোদন সম্প্রচার নিয়ন্ত্রক সংস্থা নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এক বিবাদের মুহূর্তে ড্রামাটির নায়ক-নায়িকাকে বলে 'দো টাকেকি লাড়কি'।[১৩] পাকিস্তানি গণমাধ্যমে কথাটি নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হয়। কীভাবে এই কথাটি একটি মেয়েকে বলা যেতে পারে! এ তো নারীত্বের অপমান! পাকিস্তানের জনসমাজে এই কথাটি একটি প্রচলিত প্রবাদবাক্য, যা মূলত নারীত্বকে চরম অপমান করতে ব্যবহৃত হয়। বহুল প্রচলিত এই প্রবাদটির উৎপত্তি যদিও ৫০ বছর সময়কালের বেশি নয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর মুদ্রা সূচককে বলা হয় টাকা। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বছরগুলোতে টাকার বিশ্ব বাজারে দাম ছিল কম। টাকার থেকে বহু এগিয়ে ছিল পাকিস্তানি রুপি। পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশের অবস্থান আসলে কত কমে গিয়েছে তা বোঝাতে প্রবাদটি প্রচলিত হয়। পরে ধীরে ধীরে নীচতা, নিকৃষ্টতা, চারিত্রিক দীনতার স্বরূপ বোঝাতে প্রবাদটি

ব্যবহৃত হতে থাকে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে টাকা ও রুপির মূল্যের পার্থক্যের বিষয় আমরা ওয়াকিবহুল কিন্তু নিজের ৫০ বছর আগের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব থেকে পাকিস্তান বেরিয়ে আসতে পারেনি। আর তাই হয়তো বাঙালি মেয়েদের সম্মানকে তারা দু'টাকা মূল্যেই বিচার করে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ব্যঙ্গ করে ড্রামা, চলচ্চিত্র নির্মাণ করে। ভবিষ্যতের বাংলাদেশ যে আবার ভাঙতে পারে তারও ইঙ্গিত দেয় তাদের নির্মাণগুলিতে।

নাৎসি জার্মানির তথ্যমন্ত্রী এডলফ হিটলারের প্রধান সহযোগী তার একনিষ্ঠ অনুসারী পল জোসেফ গোয়েবলস বিশ্বাস করতেন মিথ্যা কথা বারবার বলতে থাকলে তা শ্রোতার একটা বড়ো অংশ এক সময় বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে।[১৪] প্রিয় অভিনয় শিল্পীদের অভিনয় আমাদের মুগ্ধ করে, চরিত্রকে বিশ্বাস করার বিষয়ে গ্রহনযোগ্যতা তৈরি হয়। পাকিস্তানি এস্টাবলিশমেন্টের এই অপচেষ্টাগুলো প্রমাণ করে তারা ১৯৭১-এ সংঘটিত, তাদের কৃত কর্মের জন্য লজ্জিত তো নয়ই বরং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকেই প্রশ্নের মুখে ফেলতে চাইছে। প্রতিটি একাত্তর কেন্দ্রীক সিনেমার শেষে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসাবে একতা সৃষ্টির বাসনা সহ নতুন মিত্রতা তৈরি করার যে চিত্রাঙ্কন তারা করছে তা আসলে ১৯৭১-এর ধর্ষণ, গণহত্যাকে ভুলিয়ে দিয়ে; ইতিহাসকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই না।

তথ্যসূত্র:

১. আনন্দবাজার পত্রিকা। ২০২২, ১৬ অক্টোবর, পৃষ্ঠা-১৪।

২. Ahamed, Junaid. Creation of Bangladesh. AJA Publishers, 2016.

৩. Dutta, Dibyajyoti, Gupta Dr Sourav. A Study on Portrayal of Bangladesh's Liberation War in Bollywood Movies. Ouest Journals, Volume 10–Issue 4(2022) pp: 81–87.

৪. খেল খেল মে (২০২১)। Link–https://daily/x8dbmyv, Date–15.07.2025, Time–10 AM

৫. Javed, Jabbar, Link–https://images.dawn.com/news/1189248, Date– 16.07.2025, Time–5.00 PM

৬. হুয়ে তুম আজনাবি (২০২৩)। Link–https://uoutu.bu/vjmobjrSBVg?Si=Brol 22Cy2V601ST, Date–16.07.2025, Time–5.00 PM

৭. Zakaria, Anam. 1971–A People's History from Bangladesh. Pakistan and India, India, Penguin Random House of India, 2019.

৮. হাঙ্গর এস-১৩১। Link–https://youtu.be/ECxLZsWQnps?si=gGhjSS5gAqa6sPwX, Date–15.07.2025, Time–10 AM

৯. খোয়াব ট্যুট যাতে হ্যাঁয়ন। Link–https://youtu.be/RthSCY1Ng7A?si=pok-UINjFnUyKHs0, Date–16.07.2025, Time–5.00 PM

১০. Farukh Col. Z. I, Bchar Gaye, Notion press, Jan 01, 2018.

১১. যো বিছার গ্যায়ে। Link–https://youtu.be/C4u3pPGnm5o?si=7e8ilItj2ssX5kgm, Date–11.07.2025, Time–8.00 PM

১২. তেরে বিন, Link–https://youtu.be/bAWfdP2lQ_M?si=PTFUdeFJdjqK17oN, Date–11.07.2025, Time–8.00 PM

১৩. মেরে পাস তুম হো। Link–https://youtu.be/_O4Mw0ghjTo?si=8ffX2AEGTvMmuKd4, Date–11.07.2025, Time–8.00 PM

১৪. গোয়েবলস এর তথ্য। Link-https://www.irishtimes.com, Date–11.07.2025, Time–8.00 PM